নলেন গুড়েই নভেম্বর বিপ্লব

শংকর

নভেম্বরের এই সময় অপ্রবাসী বঙ্গসন্তানের মনে কোনওরকম তিক্ততা আনা সম্ভব নয়। মধুবাতাঋতায়তে শব্দটি সম্ভবত এই অগ্রহায়ণেই সোনার বাংলায় বসে কোনও স্যাংসক্রিট পোয়েট প্রথম লিখেছিলেন, এর একমাত্র কারণ খেজুর গুড়ের শুভ আবির্ভাব। খুবই দুঃখের বিষয় হত্যা, বোমবাজি, গণসংঘর্ষ, ব্যাংক ডাকাতি, রমণী দলন ইত্যাদি তিক্তসংবাদে সংবাদপত্রের হেডলাইন বোঝাই, অথচ বঙ্গভূমে নলেন গুড়ের নিঃশব্দ আবির্ভাব সম্বন্ধে একটাও খবর নেই।

কলিযুগে বোধ হয় এমনই হয়ে থাকে, বিশেষ করে আমাদের এই বেঙ্গলে, সেকেলে বাঙালিবাবু তো দূরের কথা, নিউ বংরাও জানে না যে এই দুর্দিনে ওয়েস্ট বেঙ্গলে নিউ ক্যাপিটাল ও নিউ বিনিয়োগকারী আকর্ষণ করার একমাত্র উপায় এঁদের প্রত্যেকের হাতে পাঁচশো গ্রাম নলেন গুড়ের নরম পাক অথবা কড়া পাক ধরিয়ে দেওয়া এবং মুম্বইয়ের ডাকসাইটে গোয়ানিজ বিজ্ঞাপন কপি রাইটারকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া—এমন মিষ্টি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল মিষ্টির সেরা সে যে সে যে আমার এটসেটেরা এটসেটেরা!

যাঁরা দুর্নাম রটান আইন-শৃঙ্খলা, মাওবাদ, বিনিয়োগ আকর্ষণ ইত্যাদির ব্যাপারে বাঙালির মুখ কোনওদিন মিষ্টি নয়, তার কারণ এই স্বর্গীয় সিজনে বাঙালির হাতে বিশ্বের সেরা সৃষ্টি নলেন গুড়ের সন্দেশ। অতীব দুঃখের বিষয় নলেন গুড়ের বিষয়ে কোনও রিসার্চ আজও হয়নি, এটমিক সিক্রেটের মতন খেজুর গুড়কে রহস্যের ঘোমটা দিয়ে রেখেছে। সেরা জিনিস হাতে পেলে প্রাণভরে রসনার পরিতৃপ্তি কর, কোথায় কত টন রস সংগৃহীত হয়, তার থেকে কত মিলিয়ন লিটার গুড় তৈরি হয় এসব নিয়ে লম্বা অঙ্ক কষতে যেও না।

কিন্তু এক্সপোর্ট কোয়ালিটি নিউ বং ছাড়বার পাত্র নন, এঁরা প্রয়োজনে এই অধমের কাছেও এস-এম-এস পাঠাচ্ছেন। কী করে এই নভেম্বরে এই নলেন গুড়কে নির্ভর করে বংদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা যায়। আমার সামান্য বক্তব্য, এই কলকাতায় ছ'হাজার মিষ্টির দোকান আছে এবং তাদের মালিকরা সবাই কালীপুজোর দিন থেকে নতুন গুড়ে মাতোয়ারা। ছ'হাজার মিষ্টির দোকানের পরিসংখ্যানে যাঁরা চোখ বিস্ফারিত করছেন তাঁরা জেনে রাখুন গোটা পশ্চিমবাংলায় এখন একলাখ ময়রার দোকান। মোটর গাড়ির কারখানা হোক না হোক ময়রারাই আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারবে আগামী এক শতক। স্যরি, শতক কথাটি লিখতে গিয়ে হাত একটু কাঁপছে, কিন্তু কেন কাঁপছে তা একটু পরেই নিবেদন করব, এই মুহূর্তে তিক্ততা সৃষ্টি করব না, অতি বড় শত্রুও নকুড়ের সন্দেশে নিমপাতার রস ঢেলে দেয় না।

নলেন গুড় মানেই বাংলার বুকে নিঃশব্দ নভেম্বর বিপ্লব। কিংবা বঙ্গীয় রসনার বাৎসরিক রেনেসাঁ। অতি স্বল্পদিনের আশ্চর্য উপস্থিতি, যখন শতায়ু হন মানে একশো বছরের বেঁচে থাকার শুভেচ্ছা নয়, স্রেফ একশো দিনের উপস্থিতি প্রার্থনা করা ভূমিলক্ষ্মীর কাছে, কারণ দুনিয়ার সেরা ময়রাদের মতে নলেন গুড়ের রাজত্ব হাতে গুনে মাত্র একশো দিনের মতন, যার শুরু কালীপুজোর রাত্রে। ওইক্ষণে মাকে সন্দেশ পুজো দিয়ে টপ ময়রারা আজও নতুন গুড়ের সন্দেশের পাবলিক অ্যাপিয়ারেন্স ঘোষণা করেন। তারপর হাতে গুনে একশো দিন। এর পরেও আজকাল নলেন গুড়ের সন্দেশ পাওয়া যাচ্ছে বললে ক্লাসিক কারিগররা অস্বস্তিবোধ করেন, বলেন ও তো পিস হ্যাভেনের বরফ ঠান্ডায় জোর করে ডেডবডি তাজা রাখা! যে জিনিসের যে নিয়ম! রসিকজনরা সময়ের সীমারেখা অতিক্রমের অস্থিরতা দেখান না।

একশো দিনেই তুলকালাম কাণ্ড, মনে পড়ে যায় ক্ষণজীবীরাও এই বাংলায় ইতিহাস তৈরি করে গিয়েছেন। এই একশো দিনে নকুড়, ভীমনাগ, সেনমহাশয়ের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলতে যাবেন না, বাড়তি অর্ডার সামলাতে সবাই হিমশিম খাচ্ছেন। বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু সেল অন্য সময়ের দশগুণ, নলেন গুড়ের মিষ্টির স্বাদ নেবার জন্যেও সমস্ত বেঙ্গল মাতাল।

(এরপর দশের পাতায়)

নলেন গুড়েই নভেম্বর বিপ্লব

(প্রথম পাতার পর)

প্রতিদিন যে হাজার কয়েক প্যাসেঞ্জার কলকাতা এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি চেক করাচ্ছেন তাদের ব্যাগে অবশ্যই নলেন গুড়ের সন্দেশ। মন জয় করা গুড়ের পিছনে রয়েছে খেজুর গাছ, তার জয়গানে স্বয়ং কালিদাসও রঘুবংশের কিছুটা অংশ নিয়েছেন। ভ্রমর এসে ভিড় করছে মনোরম খেজুর গাছে থোকা থোকা ফুলের কাঁদিতে। শিবকালী ভট্টাচার্য অথর্ব বেদ থেকে কোটেশন দিচ্ছেন, সূর্যকিরণের প্রখরতায় খে = আকাশে খর্জ অর্থাৎ দীপ্ত, তাই তার নাম খর্জুর। শিবকালী এরপর চাররকম খেজুর গাছের হিসেব দিচ্ছেন—কেউ একশো ফুট উঁচু, কেউ ৩০/৩৫ ফুট, আবার ভূ-খর্জুর যা ফুটখানেকের মতো লম্বা। আরও বলছেন, স্ত্রী খেজুর গাছে ফুল ও ফল হয়। পুরুষগাছে ফুল হয়, কিন্তু ফল হয় না। দূরদর্শী গ্রামবাসীরা মেয়ে গাছকে প্রাধান্য দেবার জন্য প্রতি পনেরোটি স্ত্রীগাছের জন্য একটি পুরুষগাছ রেখে বাকিগুলো নিধন করেন! মোদ্দা কথাটা হল, মিষ্টান্নের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদটুকু বাঙালির পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা, এর জন্য গতর খাটাতে হয়নি নিখিল বাঙালিকে, প্রকৃতিই নিজের খেয়ালে গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে দিয়েছে এই 'বন্য' খেজুর গাছ। এর ফল খাবার যোগ্য নয়, কাক, শিয়াল এটসেটেরা এর বীজ ছড়িয়ে দিয়েছে পথে ঘাটে মাঠে। সেখান থেকেই প্রতিবছরের মহোৎসব। একসময় এই গাছ কাটবার জন্যেও যশোর-খুলনা থেকে 'শিউলি'রা আসত, বর্ষার শেষে তারা বিশেষ নিপুণতায় গাছ 'তোলে', অর্থাৎ গাছের মাথার একদিকের পাতাগুলো গোড়া কেটে চেঁছে পরিষ্কার করত। তারপর ধৈর্য ধরে শল্যচিকিৎসকের নিপুণতায় চাঁছ দেওয়া স্থানটির নিচুতে দুটি খাঁজ কেটে একটা বাঁশের কঞ্চির 'নলী' বসাত। এই অবস্থায় ভাঁড় বসালে যে রস বার হয় তা লবণাক্ত। গাছ আর একটু শুকোলে যা নির্গত হয় তাই ভুবনবিদিত 'নলিয়ান'। এক একবার কাটবার পরে তিনদিনের বিশ্রাম। চতুর্থদিনের রসের নাম 'জিরানকাট', তারপর 'দোকাট', 'তেকাট' ইত্যাদি কত জটিল নাম। এই রসশাস্ত্র একসময় যশোর-খুলনার লোকরাই সগর্বে আয়ত্ত করেছিল। রাত্রিবেলায় যে ভাঁড় বাঁধা হয় তার রসের নাম 'ঝরা', দিনের বেলায় রস সংগৃহীত হলে 'ওলা'। যে উনুনে রস জ্বাল দেওয়া হয় তার নাম 'বাইন'। সারা দুনিয়ার লোকেদের ডেকে 'নলেন ফেস্টিভ্যাল' আয়োজন করে হইচই পড়ে যেত। নিখিল বং চিরকালই আত্মনিন্দায় মুখর, তার ধারণা কোনও ভালো জিনিসেরই প্রচার প্রয়োজন নেই। তাই বিনা প্রচারেই নলেন গুড় ও সন্দেশের মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটিয়েই যে অমৃত সৃষ্টি হয়েছে, সারা বিশ্বে তার তুলনা নেই। সোনার বাংলার সোনা রুপো সম্পদ সব হাতছাড়া হয়েছে একে একে, বাঙালির তার জন্যে কোনও দুঃখ নেই, বেঁচে থাক ইলিশ ও নতুন গুড়ের সন্দেশ। চুপি চুপি এই নতুন গুড় দই ও রসগোল্লার রাজত্বেও প্রবেশ করে হ্যাটট্রিক করেছে। এক কেজি ইলিশে মিনিমাম দশ হাজার কাঁটা—বং ছাড়া খায় কার সাধ্য। আর ভগবতীকে 'ছিন্ন' করে তৈরি 'ছানা' তো এই সেদিন পর্যন্ত ভারত ভূমণ্ডলে নিষিদ্ধ। কিন্তু দিন পালটায়! নলেন গুড়ের অমৃতস্বাদ পেয়েছে অন্যেরা, এবার সন্দেশের অন্যত্র চালান বন্ধ রাখার জন্য আন্দোলনে না নামতে হয়! দূরদর্শীরা আশঙ্কা করছেন, এমন দিন আসছে যেদিন খেজুর গুড় বলেই কিছু থাকবে না। আরে মশাই, খেজুর গাছ থাকলে তবে তো খেজুর রস, রস থাকলে তবে তো গুড়, গুড় থাকলে তবে তো নতুন গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা, দই। সারা দুনিয়ার নজর যখন বাংলার নতুন গুড়ের দিকে, ঠিক সেই সময় খেজুরগাছের বংশ বাংলা থেকে নির্বংশ হতে চলেছে। এই গাছের সুখ এতদিন চাষ না করেই পাওয়া গিয়েছে, আর পাওয়া যাবে না। মনে রাখবেন, খেজুর গাছ পুঁতলে ঝড় হতে ৬/৭ বছর লাগে, তারপর অবশ্য ২৫/৩০ বছরের ভোগ। কিন্তু খালি জায়গা কোথায়? যে অমৃত একদিন মাটির কলসিতে বিক্রি হত তা এবার হোমিওপ্যাথির শিশিতে ভর্তি হয়ে মুম্বই, দিল্লি, লন্ডন নিউইয়র্কে না চলে যায়। তা হলে উপায়? এখন থেকে হাতে গুনতি ক'বছর পরে নকুড় থাকবে, ভীমনাগ থাকবে, মিঠাই থাকবে কিন্তু নতুন গুড়ের সন্দেশ থাকবে না! ভাবা যায়? শিল্পের জন্যে জমির সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে খেজুর রসের জন্যে জমিরও একটা ব্যবসা আর্জেন্ট ব্যাপার। বাংলা ও বিশ্বের মিষ্টান্নপ্রেমীরা ইতিমধ্যেই চুপিচুপি একটা প্রস্তাব আলোচনা করছেন। ছোটগাড়ি যখন হলই না তখন হাজার একরে অর্থাৎ ষাট হাজার কাঠায় লাখ লাখ খেজুর গাছ লাগানো হোক। দু'পক্ষেরই মান রক্ষে হবে।